গীতিকবিতার মায়া

কালীকৃষ্ণ গুহ

চল্লিশ বছর আগে যৌবনে পড়া ভালো-লাগা কোনও বই এই বার্ধক্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে পুনর্বার পড়তে ভয় হয়। ভয় এই আশঙ্কায় যে বইটি আবারও ভালো লাগবে তো? এই আশঙ্কা থেকেই নরেশ গুহর 'দুরন্ত দুপুর' খুলে বসলাম। পড়লাম। অবাক হলাম। দেখলাম, ওই বইটির সঙ্গে মন বাঁধা আছে আজও। দেখলাম আরও চল্লিশ বছর আগের পড়া কত অসমাপ্ত ছিল! দ্বিতীয়বার পড়েও কি বলতে পারব যে এবারের পাঠ সমাপ্ত হয়েছে! হয়তো পারব না। আমাদের সমস্ত পাঠই অসমাপ্ত থাকে। একই রবীন্দ্রগান সুবিনয় রায়ের গলায় ১০০ বার শুনেও মনে হয় না যে শোনা শেষ হলো। গানের কথা কিছু আলাদা, মানি। সুর কথার অর্থের উপর দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু কবিতাও শুধু অর্থের উপর দাঁড়িয়ে থাকে কি? শুনছি, 'ক্ষত যত ক্ষতি যত'। সবকিছুই পিছনে পড়ে থাকে। পিছনে কত-যে মরীচিকা! ভোরের সূর্যের দান যে প্রাণকে সফল করে, তা কথায় ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না, সুরের সাহায্যে বুঝি! অনুভূতিলোকে এই বোঝাপড়া। একটা উপলব্ধিতে পৌঁছনো। কিন্তু এসবই অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় কথা। এইসব অতিরিক্ত কথা স্পর্শ করে ফিরে আসতে হবে নরেশ গুহের কবিতার প্রসঙ্গে। কথা বলার শুরুতেই তাঁকে নমস্কার জানাই। আমাদের বলার কথা অবশ্য খুব বেশি নয় — যেমন অধ্যাপকমশাইদের থাকে, পেশাদার জ্ঞানীদের থাকে।

২

নরেশ গুহর একখণ্ড 'কবিতাসংগ্রহ, জোগাড় করে দেখলাম 'দুরন্ত দুপুর'-এর (১৯৫২) পর তাঁর আর একটি মাত্র কবিতার বই বেরিয়েছে, 'তাতারসমুদ্র-ঘেরা', ১৯৭৬ সালে। অনুবাদ কবিতা বা কিশোরদের জন্য লেখা কিছু কবিতা বাদ দিলে (যা সবই 'কবিতাসংগ্রহে' রয়েছে) তাঁর কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০টির মতো, যদিও এই ছোটোদের জন্য লেখা কবিতা কিছুতেই বাইরে রাখা যায় না। 'রুমির ইচ্ছা' বা 'যুগল মেয়ে'র মতো কবিতা তো বাইরে রাখা যাবে না। তবু সারা জীবনে একজন কবি ৮০/৮৫ টি মাঝারি বা ছোট আকারের কবিতা লিখলেন মাত্র, এ কথা ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হয় — বিশেষত এইজন্য, যে, প্রথম বইটি প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে তাঁর কবি প্রতিষ্ঠা তুঙ্গে পৌঁছয়। তাছাড়া আমাদের এই বহুজন সমাজে মেধা-জ্ঞান-নাগরিকতা বা জীবিকার সূত্রে তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চবর্ণের মানুষ। তাহলে কেন তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলেন যৌবনেই, তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে শুধু এইটুকু বুঝতে পারি যে তিনি একজন বিরল স্বভাবের মানুষ, যাঁর ধর্ম সংযম। অন্য কথায় একে শুধু আলস্য হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হয়, যদিও বিদ্যাচর্চা তথা অধ্যাপনার কাজে তাঁর কোনও আলস্য ছিল না। সেক্ষেত্রে, যদি আদর্শ

না-হয়, তাহলে কি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত গুরুসঙ্গ — গুরুর ছায়ায় নীরবে মিশে থাকবার বাসনা — তাঁকে এই সংযমে উদ্বুদ্ধ করেছে? বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রখর ও মুখর এক জ্ঞানী আর বহুপ্রজ লেখক ও ভাবুকের ছায়ায় মিশে থেকে, তাঁর কাজের সঙ্গে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে জড়িয়ে থেকে, তিনি সৃজনশীল কাজের তুল্যমূল্য আনন্দ ও সার্থকতা পেয়ে গিয়ে থাকতে পারেন! এ বিষয়ে কোনো-একদিন গিয়ে নরেশ গুহর ঘরের মেঝেয় বসে প্রশ্ন করব ভেবেছি। জানি না তা ঘটবে কিনা। অরুণকুমার সরকারও একসময় নিজেকে লেখালিখি থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন, তবে তা বিষাদাক্রান্ত নিঃসঙ্গতাপ্রিয় মানুষ অরুণকুমারের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনে হয়নি, যেমন হয়েছে আনন্দসন্ধানী নম্র মানুষ নরেশ গুহর ক্ষেত্রে। এ নিয়ে আমাদের এতখানি মাথা ঘামাবার কারণ শুধু এই, যে, চল্লিশের দশকের এই দুজন ছিলেন প্রকৃত কবি; এঁরা প্রায় একটিও খারাপ লেখা লেখেননি।

৩

‘দুরন্ত দুপুর’ বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেন, ‘ভালো লেগেছে সেই কবিতার স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা, রচনাশিল্পের সৌষ্ঠব। ভালো লেগেছে লিরিকের দিকে ঝোঁক, নিচু গলায় নরম ক'রে বলার দিকে উন্মুখতা। ... ‘দুরন্ত দুপুর’ বিষণ্ণ মধুর রসের কাব্য। একটি ব্যথিত হৃদয়ের স্বগতোক্তি ওখানে শুনতে পাই আমরা — কিন্তু ব্যথিত ব'লে বিক্ষুব্ধ নয়।’ অব্যর্থ এই মহাজন-কথন। তিরিশের দশকের জ্ঞানীকবিরা নতুন কবিতা লেখার সূত্রপাত করলেন সারা বিশ্বের সাহিত্যের ও জ্ঞানের উত্তরাধিকার নিয়ে। সেখানে, জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর উপর ভর করে কবিতায় এল বহু জটিল ও ব্যাপ্ত জীবনজিজ্ঞাসা — এল ইতিহাস ও সময়চেতনা, বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার নিয়ে নানা আস্তিত্বিক প্রশ্ন — দেশ, সমাজ, সামাজিক মুক্তির প্রশ্ন। স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা, লিরিকের দিকে ঝোঁক কমে এসেছিল যা আবার চল্লিশের কবিদের হাত ধরে ফিরে এল। ব্যক্তিক বিষণ্ণতা ফিরে এল, যা প্রেমের কবিতার আত্মা নির্মাণ ক'রে। রচিত হলো নরেশ গুহর ‘বিষণ্ণ মধুর রসের কাব্য’ — ‘দুরন্ত দুপুর’। বিষণ্ণ, কিন্তু বিক্ষুব্ধ নয়। অবশ্যই। প্রত্যেকটি কবিতা সুগঠিত। তিনি লিখলেন,

আর, দ্যাখো, চিঠির বাক্সটা যেই খুলি
রোজ কিছু চিঠি থাকে! অলৌকিক কে ডাকপিওন,
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি।
(অলৌকিক / অংশ)

এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম
এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে কী তবে হলাম?
...
আমাকে অমর করার মন্ত্র সে বুঝি জানতো।
সে অপার্থিব, সে অফুরন্ত।
সে যেন আমার লক্ষ্যবিহীন সকল গানের
অকুল মোহানা। সে যেন আমার অধীর প্রাণের
চিরপ্রতীক্ষা।
(এক বর্ষার বৃষ্টিতে / অংশ)

কিছু একটা 'অলৌকিক' আছে জীবনে! যে প্রেমের চিঠি ফেলে যায় ডাকবাক্সে সেই ডাক-পিওন অলৌকিক — চিঠিগুলি যেন 'রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি' ! এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রেমিকাকে মায়ার জগতে, অলৌকিকে, স্পর্শ করা যায় যেন! নরেশ গুহর হাতে ফিরে এল গান — কবিতার আদিকল্পে যে গান, তা-ই। জীবনানন্দও নানা ভাঙনের মধ্য থেকে মাথা তুলে বলেছিলেন, 'আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ করে।' অবশ্যই 'তবুও' শব্দটি একটি ধ্বংসস্তূপের মাথা, যে ধ্বংসস্তূপ জীবনানন্দ নিজে। নরেশ গুহর কবিতা পাঠ করে নিঃশ্বাস নেওয়া নিশ্চয় অনেক সহজ হয়ে এসেছিল! 'প্রার্থনা' নামের কবিতায় তিনি বললেন;

হে অনন্ত একতারা সুর,
হে রাত্রিশেষের তারা
ক্ষীণ আয়ু, হে অশ্রুবরণী
বসন্ত ব্যাকুল শাখা সর্বপত্রহারা, —
দাও, গান দাও।

লক্ষ করতে হয়, গানের প্রার্থনার এই ব্যাকুলতা! মনে পড়বে, 'সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা।' আধুনিকেরা একসময় যেন গানকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন চুক্তিবুদ্ধির তান্ত্রিকতায়! তা ফিরে এল স্পষ্ট উচ্চারণে। শুধু রাত্রিশেষের তারার কাছে এই প্রার্থনা নয়, এই প্রার্থনা 'অশ্রুবরণী'র কাছেও। সমস্ত বৃক্ষশাখা থেকে পাতা ঝরে গেছে। এখন গান চাই।

যেমন গানের কাছে ফেরার ব্যাকুলতা তেমনি প্রকৃতির কাছে ফেরার ব্যাকুলতা থাকে জীবনে — বিশেষত শহরের ইটকাঠের অবরোধের মধ্যে বসে জ্ঞানসাধকের নিশ্চিত তর্কজীবী জীবনে —

তাহ'লে ফাল্গুনে দেখছি — আরে, তাই তো, সত্যি যে পলাশ!
এতো লাল?
ঐ কি রঙ্গন?
পৌঁছলাম শান্তিনিকেতন।
(ফাল্গুন ১৩৫৯/(অংশ)/তাতারসমুদ্র-ঘেরা)

আবার সংসারের দৈনন্দিনের কথাও সবিস্তারে এসে পড়ে এই কবির কবিতায়, যা কবিতার মধ্যে একটি বলয় তৈরি করে — একটি সত্যের বলয়, যা মায়ায় গিয়ে মিশতে চায় — যেমন ঘটেছে অমিয় চক্রবর্তীর অনেক আশ্চর্য কবিতায়। নরেশ গুহ লিখেছেন —

চ'লে যেতে হবে? মনে হয় যেন মায়া।
বর্ষার ঘাট জলে ছলছল,
অনুরাগে আঁকা চোখের কাজল,
ভরা বুক কাটে সাঁতার।
পিতলের হাঁড়ি, বিছানা, চাদর,
পোষা ভেড়া গরু কুড়োয় আদর।
ঘুম চোখে নেই : স্বপন বিছানো ঘরসংসার পাতার।

দৈনন্দিনের এইসব চিরকালীন চিত্র রচনা করে কবি এসে পৌঁছন কবিতাটির শেষ স্তবকে :

এরই মাঝখানে চলে আনাগোনা,
ছায়াতলে আরো ঘন ছায়া বোনা,
মুছে ফেলবার নিষ্ঠুর এক জটলা।
যা হবার হয়; যাবার সময়
হাটে যায় লোক, হেসে কথা কয়।
থাকে যা থাকার। এ-মাটির মূল অটলা।
(মৃত্যুর পাখি/(অংশ) দুরন্ত দুপুর)

যা হবার তা হয়। থাকে যা থাকার। কী থাকে? মাটি, মাটির মন। যে মায়ার কথা বলা হলো এখানে তা শংকরাচার্য-প্রচারিত মায়া নয়। তা বাস্তবের মায়া। আমরা বাস্তবের মায়ার মধ্যেই জীবন কাটাই — শূন্যের অনন্ত পরিসরে, গানে, কবিতায়, শিল্পে, প্রেমে, বিষাদে। এই মায়ার উৎসে রয়েছে জীবনের নশ্বরতা, ব্যাখ্যাতীত নানা বিস্ময়, নানা রহস্যের পতাকা উত্তোলন। নানা ভয়।

তবে কেন ভয় করি? কার অভিশাপ
আমাকে নিরস্ত করে? যদি চাই এ-সবই তো পারি!
আমার সময় আজ। পৃথিবী আমারই।
গ্রীষ্মের বেদীতে বসে নটী প্রকৃতির
উপচার গ্রহণের আমার যে উত্তরাধিকার
সে-কথা জেনেছি আমি। সেই সঙ্গে জানি,
আরতির শেষে
বিসর্জনের সুর উদ্দাম ঢাকিরা অনায়াসে
একদা বাজাবে।
(আমার বন্ধুকে/(অংশ)/দুরন্ত দুপুর)

প্রকৃতির এক প্রবাহমান অরচিত খেলার সঙ্গে মিশে থাকতে থাকতে, আরতির শেষে, এক সময় বিসর্জনের সুর বেজে ওঠে! 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।' এভাবেও বলা হয়েছে, আরও অনেক বিস্তার নিয়ে।

৪

'দুরন্ত দুপুর'-এর আলোচনার শেষে বুদ্ধদেব বসু যে পরামর্শ দেন তাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ করতে হয় : 'তাঁর মধ্যে গীতিকাব্যের যে-তাপটুকু আছে, সেটুকু যত্নে লালন ক'রে কোনো একটা বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা — এতেই, আমার মনে হয়, তাঁর পরিণতির পথের তিনি নির্দেশ পাবেন।' নিঃসন্দেহে একটি সুপরামর্শ। কিন্তু, তবু প্রশ্ন, এই গুরুবাক্যই কি নরেশ গুহর পথে একটি অনুচ্চারিত বাধা হয়ে দাঁড়ালো? সর্বজন-প্রশংসিত সময়-ইতিহাস-বিশ্ববীক্ষার বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে' তিনি কি তাঁর গীতিকাব্যের তাপ প্রয়োগ করার আগ্রহ বোধ করলেন না? এ একটা কূট প্রশ্ন যা এখন আর তোলার

সময় নেই। প্রসঙ্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতা সম্পর্কে তাঁকে যা বলেছিলেন তাও মনে রাখা যায় : ‘মালার্মের মতে যে-রহস্য কবিতার প্রাণ, তাতে আপনার কাব্য সমৃদ্ধ; এবং সেই সঙ্গে কলাকৌশল সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ প্রখর।’ এই যথেষ্ট সার্থকতার স্বীকৃতি। আজ, এতদিন পরেও, আমরা বিশুদ্ধ কবিতার গুণাবলি সহজেই খুঁজে নিতে পারি তাঁর কবিতায়।

‘ছড়ানো প্রাণের মেলা’য় ভ্রমণকারী এই কবি বুঝতে পারেন, ‘তাতারসমুদ্র-ঘেরা জননী বসুধা একাকিনী, / উদাসীন ধুলোর প্রাঙ্গণ।’ মাঝে-মাঝেই, নানা তুচ্ছ অথচ অনতিক্রম্য পসরায় মেলা জমে ওঠে। খেলা-দেখানোর লোক এসে ডুগডুগি বাজিয়ে যায়। ডুগডুগি কী বলে? ডুগডুগি বলে,

চলো মেলায়, চলো মেলায়,
বেলা এলায় মাঠে বনে,
রাঙা ধুলো তুলি বুলোয় প্রাণেমনে।

ডুগডুগি এই কথা বলে। একজন কবি শুনতে পান। তাঁর ভাষ্য থেকে আমরাও শুনে নিই। এই তো আমাদের কবিতা পড়ার সার্থকতা। আমরা আরও শুনে নিই স্মৃতি ও সময়ের কথা একটি সরল অথচ আন্তরিক রূপারোপে :

স্মৃতির সুতোয় যত গাঁথি হার
জানি একদিন হারাবে সবই,
সব ছবি সব ভালো ছবি সব কালো ছবি।
শুধু চ’লে যাওয়া, আর কিছু নয় :
তাকিয়ে দেখার বেশি অধিকার
দেবে না সময়।

(প্রাণের মিত্র / তাতারসমুদ্র-ঘেরা)

সবকিছুই হারিয়ে যাবে। সব স্মৃতিধৃত ছবিও — ‘সব ছবি সব ভালো ছবি সব কালো ছবি।’ দেখার বেশি অধিকারও জীবনে পাওয়া যাবে না সময়ের কাছ থেকে। এইখানেই যত রহস্য, যত মায়া, যত মর্মলোকের উন্মোচন! এইখানেই একজন কবির কাজের জায়গা। ভাবতে ভালো লাগছে যে নরেশ গুহ এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁর কাজ করেছেন একসময়। অল্পই কাজ করেছেন তিনি, খুব ‘বড়ো পরিপ্রেক্ষিত’ অর্জনের যুদ্ধে যোগ দেয়ার আগ্রহ বোধ করেননি। কিন্তু তাঁর কাজটুকু — স্বল্প পরিসরের কিছু কবিতা — অম্লান হয়ে আছে। এইরকম একটি কবিতা — ‘তুমি কী সুন্দর’ — পড়ে নিয়ে আজ রাত্রির আহার গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করব।

তুমি কী সুন্দর তাই ভাবি।
তোমাকেই করা সাজে মর্ত্যলোকে অমরতা দাবি।
তোমার হেমন্ত দূরে, দূরে শীত, আকাশ উজ্জ্বল :
তোমাকে সাজে না করা ছল।
দুরাশা রাখিনি মনে, জীবনের অগণিত ক্ষতি

যদিও সহসা আজ এক ঝাঁক উড্ডীন প্রজাপতি।
যত ক্লেশ, যত ক্লান্তি, ভয়,
যৌবনের সব অপচয়,
সব মিথ্যা অপগত তোমার কারণে একদিন।
তুমি কী সুন্দর তাই কী সুন্দর আকাশে আশ্বিন।

এই কবিতাটির সঙ্গে মন বেঁধে নিলাম।
গীতিকবিতার মায়ায় বাঁধা পড়ে থাকতেই ভালো লাগে এখন।

'অহর্নিশ' পত্রিকার নরেশ গুহ সংখ্যা ২০০৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত। রচনাটি শুভাশিস চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কালীকৃষ্ণ গুহ : বিশিষ্ট কবি।